ইউনিট ৪

জ্বালানি

ভূমিকা

রান্নাবান্নার কাজে আমরা তাপ ব্যবহার করি। যানবাহন চালনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি যাবতীয় কাজেও তাপের একটা ভূমিকা রয়েছে। কিরূপে আমরা এ তাপ পেয়ে থাকি? কাঠ-কয়লা, খড়কুটা প্রভৃতি পুড়িয়েই যে শুধু আমরা তাপ পেয়ে থাকি তাই নয়, তেল, পেট্রল, কেরোসিন, বাঁশ, কাঠ কয়লা, গাছের শুকনো পাতা ইত্যাদি আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। এ সকল জ্বালানি কিন্তু জৈব পদার্থ। কারণ আমরা এগুলি উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি। জৈব কথার অর্থ জীব হতে পাওয়া।

পাঠ ১

জীবাশ্ম জ্বালানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবাশ্ম জ্বালানি সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- খনিজ কয়লা, তৈল, গ্যাস প্রকৃতিতে কিভাবে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খনিজ জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- জ্বালানির অপচয় রোধে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

জীবাশ্ম জ্বালানি সৃষ্টির রহস্য

কোটি কোটি বছর পূর্বে গাছ-পালা ও জীবজন্তু প্রচন্ড ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বা অন্য কোনো কারণে মাটি চাপা পড়ে যায়। এদেরই দেহাবশেষ এ জীবাশ্ম কঠিন বা তরল আকারে খনি থেকে তুলে তাপ শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এদেরকেই জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।

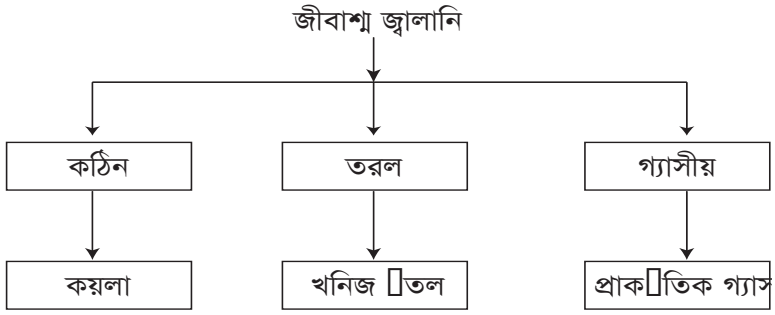

চিত্র ৪.১-১ : জীবাশ্ম জ্বালানির প্রকারভেদ

নিম্নে জীবাশ্ম জ্বালানি সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করা হলো-

- **কয়লার সৃষ্টি :** কোটি কোটি বছর পূর্বে ভূপৃষ্ঠে যে গাছপালা জন্মেছিল সেগুলো মরে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এদের দেহাবশেষ কাদা, পলি ইত্যাদির সাথে মিশে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। অতঃপর ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হেতু এদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। ভূ-অভ্যন্তরে প্রচন্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশ কয়লায় পরিবর্তিত হয়। এভাবে অবিশুদ্ধ কার্বন তৈরি হয়েছে।
- **খনিজ তেলের সৃষ্টি :** খনিজ তেলের প্রতিশব্দ হচ্ছে পেট্রোলিয়াম। ইহা একটি ল্যাটিন শব্দ যা দুটো শব্দ নিয়ে গঠিত পেট্রো + অলিয়াম। পেট্রো শব্দের অর্থ রক বা শিলা এবং অলিয়াম শব্দের অর্থ অয়েল বা তৈল। অর্থাৎ পাথরের বা শিলার স্তরে সঞ্চিত যে তৈল তাহাকে পেট্রোলিয়াম বলে।
- আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে গাছ-পালা ও প্রাণিদেহের দেহাবশেষ জৈব বিধ্বংসী পাতন প্রক্রিয়ার ফলে খনিজ তেলের সৃষ্টি হয়। ইহা কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ।

- **প্রাকৃতিক গ্যাসের সৃষ্টি :** খনিজ তৈলের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। ইহার প্রধান উপাদান হলো মিথেন, ইথেন প্রভৃতি। পেট্রোলিয়ামকুপ হতেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

উৎপাদন ও ব্যবহার

কয়লা : মাটির তলায় হাজার হাজার ফুট গভীরে কয়লা পাওয়া যায়। এ কয়লা উৎপাদন বা উত্তোলনের জন্য মাটি খুড়ে গভীর গর্ত করা হয়। অতঃপর যে সমস্ত জায়গায় কয়লা সঞ্চিত আছে সে সমস্ত জায়গায় সুড়ঙ্গ করে শ্রমিকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে কয়লা আহরণ করে। আহরিত কয়লা ট্রলিতে বোঝায় করে লিফটের মাধ্যমে তা উপরে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন জ্বালানি মানের কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লার মজুদ সীমিত। খনি থেকে একবার কয়লা তুলে ফেললে সেখানে আর নতুন কয়লা হয় না। আমাদের বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।
রান্নাবান্নার কাজে কয়লা ব্যবহার করা হয়। কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করে স্টিম ইঞ্জিন চালান হতো, বর্তমানে কয়লা দ্বারা উৎপাদিত বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
খনিজ তেল : প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ কাদা ও বালিতে ভূত্বকের বেশ গভীরে ঢাকা পড়লে, ভূঅভ্যন্তরের প্রচন্ড তাপ ও চাপে, বায়ুর অনুপস্থিতিতে বিধ্বংসী পাতনের ফলে কঠিন যে বস্তুর সৃষ্টি হয় তা কয়লা এবং তরল যে যৌগের সৃষ্টি হয় তা হলো খনিজ তেল। ইহা একটি কার্বন এবং হাইড্রোজেনের যৌগ। প্রকৃতিতে গ্যাসও একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়।
ভূ-তত্ত্ববিদগণ মাটির অভ্যন্তরের গঠন নিরূপণ করে তেলের অস্তিত্ব জানার জন্য নানা-রকম পরীক্ষা করেন। মাটির অল্প গভীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ চালিয়ে ভূ-গর্ভস্থ তথ্য নির্দেশক ম্যাপ তৈরি করা হয়। এই মানচিত্র দেখে বিজ্ঞানীগণ খনি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করেন। তারপর মাটি খুঁড়ে এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হতে হয়। যেহেতু খনি হতে তেল আহরণ একটি ব্যয়সাধ্য ব্যপার সেহেতু উত্তোলনের পূর্বেই খনিতে সঞ্চিত তেলের পরিমাণ অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হবে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উত্তোলনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এখানেও মাটি ড্রীল করে পাইপ বসান হয় কুপের মধ্যে। যেহেতু ভিতরের চাপ বেশি থাকায় বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বেশি থাকে সেহেতু ড্রিল করা এবং পাইপ বসানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে পাইপের মাধ্যমে খনি থেকে তেল উত্তোলন করা হয়।
যেহেতু জীবাশ্ম ও উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ থাকে সেহেতু তেলের মধ্যে অনেক পদার্থের মিশ্রণ থাকে। হাজার রকম উপাদান নিয়ে তেল গঠিত। উত্তোলিত তেলকে অশোধিত তেল বলে। এই অশোধিত তেলে কার্বনের সংখ্যা অনুসারে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, লুব্রিকেটিং তেল, গ্রীজ, পেট্রোলিয়াম জেলি, আলকাতরা, পিচ ও আরও জৈব পদার্থ থাকে। শোধনাগারে আংশিক পাতনের মাধ্যমে কার্বন সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন অংশ পৃথক করা হয়। তেলের বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবহার নিম্নে দেয়া হলো :

উপাদান	ব্যবহার
রিফাইনারী গ্যাস	১. ইহা সাধারণত মিথেন ও ইথেন গ্যাসের মিশ্রণ। সিলিন্ডার ভর্তি করে তা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। (কার্বন সংখ্যা ১ ও ২) ২. কার্বন সংখ্যা ৩ ও ৪ কে বলা হয়- প্রপেন ও বিউটেন। ইহাও গ্যাস লাইটারে জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সি-৫ থেকে সি-৭ পর্যন্ত তরল জৈব দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
পেট্রোল	ইহা সাধারণত : সি-৮ কার্বন হতে সি-১০ কার্বন পর্যন্ত। মটরগাড়ির জ্বালানীরূপে, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি এবং প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।
কেরোসিন	ইহাও কার্বন ও হাইড্রোজেন নিয়ে গঠিত একটি যৌগ। গৃহকর্মে, চুলা এবং হারিকেনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
জেট পেট্রোল	জেট বিমান ও উড়োজাহাজে জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়।
ডিজেল তেল	রেলগাড়ি, লরি, ট্রাক্টর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
লুব্রিকেটিং তেল	প্রধানত রাসায়নিক দ্রব্য, মোম, পালিশ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণে লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহৃত হয়।
জ্বালানী তেল	জাহাজ ও ভারীশিল্পের চুল্লির জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়।

বিটুমিন	রাস্তা বা বাড়ির ছাদের আবরণে ব্যবহৃত হয়। ওয়াটার প্রুফিং এ ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়া পেট্রোলিয়াম হতে পলিমারকরণ পদ্ধতিতে, পলিথিন ফেশার, পি.ভি.সি সিট, পাইপ, নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের দ্রব্যাদিসহ সিনথেটিক কাপড় তৈরি হয়। ইহা ছাড়াও পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল হতে হাজারো রকমের জৈব দ্রাবক তৈরি হয় যা আমরা অন্যান্য দ্রব্য তৈরিসহ গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারি।

প্রাকৃতিক গ্যাস : আমাদের দেশে খনিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে। বর্তমানে সিলেটের হরিপুর, কুমিল্লার বাখরাবাদ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। গ্যাস সহজে বা নল যোগে পাম্প করে স্থানান্তর করা যায়। অনেক দেশ তরল গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তি করে বাজারজাত করে থাকে। সকল জৈব যৌগে কার্বন থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল জৈব পদার্থ। এগুলো কার্বন ও হাইড্রোজেন বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের ফলে গঠিত হয়। এদের সাধারণ সংকেত হলো (C_nH_{2n+2})। প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে প্রথম গ্যাস হলো মিথেন। যার সংকেত (CH_4)। রাতের অন্ধকারে ডোবানালায় ভূতের আগুন দেখা যায়। ইহা আসলে মিথেন গ্যাস। ডোবা-নালায় ঘাস পাতা পঁচে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। এই মিথেন গ্যাস ফসফরাসের উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে আগুন ধরে যায়। আসলে এটি কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়।

তেলের মতই ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ করে গ্যাসের সন্ধান করা হয়। কোথাও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেলে খনন করে মাটির গভীরে পাইপ প্রবেশ করিয়ে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। এটা জটিল প্রকৌশল প্রক্রিয়া। অতঃপর সরবরাহের জন্য পাইপ, শাখা পাইপ ইত্যাদি বসিয়ে বহুদূর পর্যন্ত গ্যাস নিয়ে যাওয়া হয়। সরবরাহ নল অবশ্যই বায়ু অপ্রবেশ্য হতে হবে। এভাবে ঘর বা কল-কারখানা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়।

খনিজ তেলের মত গ্যাসেরও একই ধরনের বহুবিধ ব্যবহার আছে। রান্না ও কল-কারখানায় গ্যাস জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। পলিমারাইজেশন পদ্ধতিতে গ্যাসের পলিমারকরণ করে রাবার, পি.ভি.সি, পলিথিন, বিভিন্ন ধরনের কাপড় বুনা সুতা, ভূসা কালি, হাজারও রকমের জৈব দ্রাবক, প্লাস্টিক, ফরমিকা, ঔষধ, রঞ্জক দ্রব্য, মৃতদেহ সংরক্ষণকারী পদার্থ, বিস্ফোরক ইত্যাদি তৈরি হয়।

জ্বালানির অপচয় রোধ

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা শক্তির ব্যবহার করছি। জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের শক্তির একটি বিরাট উৎস। কিন্তু এই শক্তি সীমিত এবং এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই জ্বালানি ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে তাই আমাদের শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। নিম্নোক্ত উপায়ে আমরা জ্বালানির অপচয় রোধ করতে পারি।

- রান্নাবান্নার শেষে চুলা বন্ধ রাখা।
- গ্যাসের চুলার উপর কাপড় শুকা বন্ধ করা।
- পথের মধ্যে থামতে হলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ রাখা।
- যানবাহনের ইঞ্জিন ত্রুটি মুক্ত রাখা। কারণ ত্রুটিযুক্ত ইঞ্জিনে জ্বালানি বেশি খরচ হয়।
- ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া।
- জ্বালানি শক্তিকে বাণিজ্যিক সম্পদ না ভেবে সমষ্টিগত সম্পদ বিবেচনা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- জীবাশ্ম জ্বালানি মূলত উদ্ভিদ হতে সৃষ্টি। কোটি কোটি বছর আগে গাছ-পালার মৃত দেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে কঠিন তাপ ও চাপে বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লা, তেল এবং গ্যাস উৎপন্ন করে শিলার খাঁজে খাঁজে জমা হয়। এগুলোই হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ।
- কয়লা, তেল ও গ্যাসের ব্যবহার অপরিসীম। কলকারখানা, গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ, প্লেন থেকে গৃহস্থালীর রান্নাবান্নার কাজেও কয়লা, তেল ও গ্যাসের ব্যবহার করা হচ্ছে।
- যেহেতু জ্বালানি সঞ্চয় সীমিত সেহেতু জ্বালানির অপচয় রোধ না করলে আমরা আর সামনের দিকে এগুতে পারব না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জীবাশ্ম কঠিন বা তরল আকারে খনি থেকে তুলে কিরূপে ব্যবহার করা হয়।
   ক) ধ্বংসাবশেষ হিসাবে খ) ফসল রূপে
   গ) জ্বালানি রূপে ঘ) বর্জ্য পদার্থরূপে

২. গাছ-গাছড়া, জীব জন্তুর দেহাবশেষ কে কি বলে?
   ক) ফসিল খ) ধ্বংসাবশেষ
   গ) জীবাশ্ম ঘ) বায়োগ্যাস

৩. জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কোনটাকে বুঝায়?
   ক) ফরমালডিহাইড খ) ফরমিকা
   গ) কাঠ, কয়লা ও পাটখড়ি ঘ) কয়লা ও খনিজ তেল

৪. কয়লা কি?
   ক) বিশুদ্ধ কার্বন খ) অবিশুদ্ধ কার্বন
   গ) বায়োগ্যাস ঘ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

পাঠ ৪.২

শক্তির বিকল্প উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিকল্প শক্তির উৎস সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- বায়োগ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিকল্প শক্তি

এ যাবৎ প্রাপ্ত শক্তির মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবিরত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি সম্ভাবনাময় উৎস হিসাবে আবির্ভূত হলেও এর প্রারম্ভিক খরচ, শক্তি সরবরাহে অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি এবং বৃহৎ শক্তির একচেটিয়া প্রভাব একে উন্নয়নশীল ছোট ছোট দেশগুলোর নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস অমূল্য সম্পদ, এটা সীমিত এবং নবায়নযোগ্য নয়। তাই এ শক্তির উৎসের উপর সব সময় নির্ভর করা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় ১৩ কোটি লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্নাবান্নার কাজে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টন প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। এসব জ্বালানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে কাঠ, খড়কুটো, গোবর ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ। এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু রান্নাবান্নার কাজে জ্বালিয়ে ফেলার কারণে মাটি জৈব সার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (Micronutriont) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, চীন দেশের জমিতে জৈব আবর্তন চক্র ৬৫ শতাংশ। সেখানে আমাদের বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১১ শতাংশ।

রান্নার কাজে প্রচলিত জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে দেশের শুধু বনজ সম্পদই ধ্বংস হচ্ছে না। আমাদের আবহাওয়াতেও নেমে আসছে বড় ধরনের বিপর্যয়।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে জ্বালানির এ বিরাট খাতে বিকল্প উৎসের সন্ধান করা হচ্ছে অবিরত। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এবং সৌর শক্তিকে আংশিক কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। সমুদ্র স্রোত ও বায়ু শক্তি এক একটি উৎস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তিকে কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানো যায় তারও চেষ্টা চলছে পুরোদমে।

বায়োগ্যাস

ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরে গ্যাসের চুলায় রান্না করতে দেখা যায়। এ গ্যাস তিতাস বা বাখরাবাদ গ্যাস নামে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাস হতে সিলেট ও চট্টগ্রামে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুরূপ গ্যাস নানা রকম প্রাণী ও উদ্ভিদের বর্জ্য থেকে তৈরি করার ব্যবস্থা করা যায়। এ ধরনের গ্যাসকে বলে বায়োগ্যাস।

বায়ো অর্থ জীবন। প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনের অধিকারী বিধায় এদের দেহ এবং দেহ নিঃসৃত পদার্থ পচনশীল। গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটো প্রভৃতি পদার্থ পানিতে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতি রাখলে এক ধরনের

ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে Fermentation) বা গাজন প্রক্রিয়া ঘটে। ফলে এক ধরনের বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর শতকরা ৬০-৭০ ভাগই মিথেন গ্যাস। ইহাই বায়োগ্যাস নামে পরিচিত।

বায়োগ্যাস উৎপাদন

বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তি খুবই সাধারণ ও চিত্তাকর্ষক। যে ধরনের ব্যবস্থায় বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয় তাকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বলে। দুনিয়ার সকল দেশে দু'ধরনের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহৃত হয়। যথা- ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট।

কারখানা বা প্ল্যান্ট নির্মাণে উপকরণের সহজলভ্যতা, খরচ, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে এর ধরন বা মডেল নির্বাচিত হয়ে থাকে। কাঁচামাল হিসাবে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরীপানা বা জলজ উদ্ভিদ বায়োগ্যাস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও মানুষের মলমূত্রও বায়োগ্যাস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট : নিচের চিত্রে বিভিন্ন অংশের নামসহ একটি ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান দুটি অংশ আছে। যে অংশ নিচে থাকে তাকে ডাইজেস্টার বা কোমলায়ন যন্ত্র বলে এবং যে অংশটিতে গ্যাস জমা হয়ে থাকে তাকে গ্যাস হোল্ডার বা গ্যাস ধারক বলে। গোবর বা যে কোনো পদার্থকে নির্দিষ্ট অনুপাতে পানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রবেশ কুয়ায় রাখলে তা প্রবেশ নলের মাধ্যমে ডাইজেস্টার যন্ত্রে চলে যায়। এখানে গাজন প্রক্রিয়া ঘটে এবং গ্যাস উৎপন্ন হয়।

সৃষ্ট গ্যাস স্লারির মধ্যে আংশিক নিমজ্জিত ভাসন্ত গম্বুজে জমা হয়। ভিতরে গ্যাস বৃদ্ধির সাথে সাথে ধারকটি উপরের দিকে উঠে। এ ধারক গম্বুজটি ধাতব পদার্থ যেমন- এম এস শিট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। এ মডেলে তরল/স্লারি

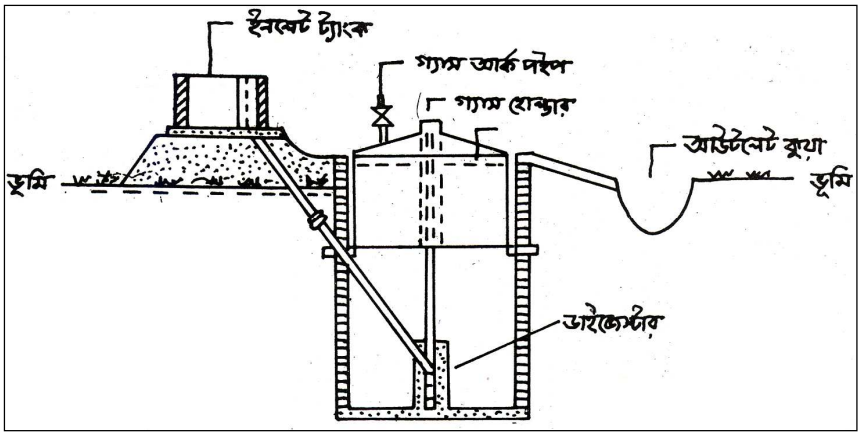

চিত্র : ৪.২-১ ভাসমান ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

জাতীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। ধারক গম্বুজে মজুদ গ্যাস নির্গম নল দিয়ে ব্যবহারের জন্য নেয়া হয়। কোমলায়ন যন্ত্রে প্রবিষ্ট পদার্থ বায়ুর অনুপস্থিতিতে পঁচে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে ডান পাশের কুয়ায় গিয়ে পড়ে। এ রেসিডিউ মূল্যবান জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভাসন্ত ডোম বিশিষ্ট জৈব গ্যাস কারখানা তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশি কার্যক্ষম থাকে না। এর গ্যাস ধারকটি এম এস শিট দিয়ে তৈরি বলে মরিচা ধরে ছিদ্র হয়ে যায়। গ্রামে-গঞ্জে পরিবহন ও ওয়েলডিং সুবিধা থাকে না বলে এগুলো অকেজো হয়ে পড়ে।

স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট : ভাসন্ত ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের স্থায়িত্ব কম এবং খরচ বেশি পড়ে। এ জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। নিচের চিত্রে বিভিন্ন অংশের নামসহ একটি স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট দেখা যাচ্ছে।

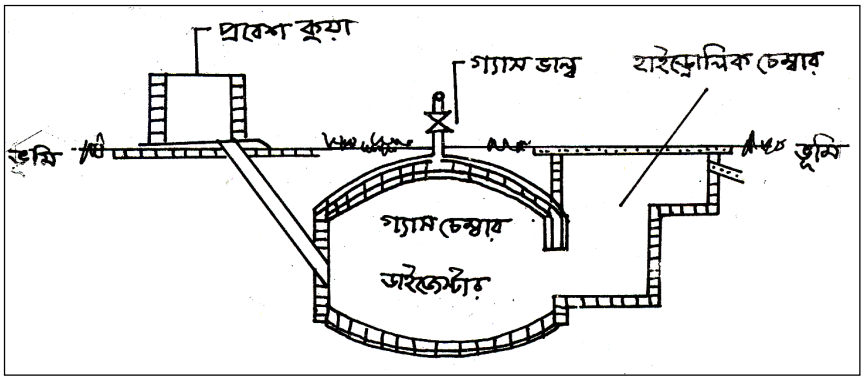

চিত্র : ৪.২-২ স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে এর সমগ্র অংশ তৈরি হয়। এর নির্মাণ খরচ কম এবং স্থায়িত্ব অনেক বেশি। একবার নিশ্ছিদ্র করে তৈরি করতে পারলে নির্বিঘ্নে এটা ২০ বছরের অধিক কার্যক্ষম হবে। গম্বুজের মাঝখানে সুবিধামত গ্যাস ভাল্ব বসিয়ে তার সঙ্গে নলের সংযোগ দিয়ে গ্যাসকে ব্যবহারের জায়গায় নেয়া হয়। এ ধরনের প্ল্যান্টে আলাদা কোনো গ্যাস ধারক নেই। ফলে স্লারি কোমলায়ন যন্ত্রের নিচে নেমে গ্যাসের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর চাপও বেড়ে যায়। এটা সম্পূর্ণরুপে মাটির নিচে থাকে বিধায় কোনো জায়গা অপচয় হয় না। এই মডেলের প্লান্টে কঠিন, তরল ও স্লারী জাতীয় সবরকম কাঁচামাল ব্যবহার করা যায়।

গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ডাইজেস্টার বা কোমলায়ন যন্ত্র। ৭-৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের রান্না-বান্না ও বাতি জ্বালানোর চাহিদা মেটানোর জন্য ২.৫ মিটার ব্যাস ও ২.২ মিটার গভীর গোলাকার কুয়া খনন করে এর তলার মধ্যবিন্দু আর্চের মত করে নির্মাণ করা হয়। এর বাম দিকে প্রবেশ নলের এবং ডানদিকে হাইড্রলিক চেম্বারের খোলাপথ রাখা হয়। ডোমের উপরের অংশে গ্যাস নির্গমনের জন্য একটি ১.২৭ সে.মি ব্যাস বিশিষ্ট ২৫ সে.মি লম্বা জি আই পাইপ খাঁড়াভাবে স্থাপন করতে হয়। এই পাইপের উপরের অংশে গ্যাস ভালব সংযুক্ত করতে হয়। হাইড্রলিক চেম্বারের মুখের উপর থেকে ডোমের উপরিভাগ বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করা হয় যাতে এটি নিশ্ছিদ্র হয়।

হাইড্রলিক চেম্বারটি একটা আয়তাকার চৌবাচ্চা। বিশেষ পরিমাপ মত এটি নির্মিত। ব্যবহৃত স্লারির নির্গমনের জন্য একটি খোলাপথ বা দরজা রাখা হয়। এই হাইড্রলিক চেম্বারের উপরের অংশ স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

প্রবেশ নলের মুখে থাকে পুরু ইট নির্মিত চৌবাচ্চা। এর ভিতরের অংশ ভালোভাবে প্লাস্টার করে দিতে হয়। ডাইজেস্টার, হাইড্রলিক চেম্বারও প্রবেশ নলের মুখের চৌবাচ্চা তৈরির পর প্ল্যান্টটির চারপাশ মাটি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হয় যেন ডোমের উপরের অংশ মাটির নিচে থাকে।

প্ল্যান্ট চালু করা

প্ল্যান্ট চালু করার সময় ১.৫-২ টন কাঁচামাল যেমন হাঁস-মুরগীর মল, মানুষের মল জাতীয় পচনশীল পদার্থের প্রয়োজন। এই কাঁচামাল এবং পরিষ্কার পানি, গোবরের ক্ষেত্রে ১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে প্রবেশ নল দিয়ে আস্তে আস্তে কুয়ায় ঢালতে হয়। এসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটির ঢেলা, পাথর, বালি, বড় আকারের খড়কুটা ঢুকে না পড়ে। প্ল্যান্ট সম্পূর্ণ ভর্তি না হলে পানি দ্বারা বাকি অংশ ভর্তি করে দিতে হয়।

গ্যাস ভাল্ব এর ছিদ্র পরীক্ষা করে পি ভি সি/জি আই পাইপ দ্বারা প্ল্যান্ট থেকে চুলা, হ্যাজাক লাইট বা জেনারেটর পর্যন্ত সংযোগ করতে হবে। বায়োগ্যাসে পানি মিশ্রিত থাকে। তাই সরবরাহ লাইনের মাঝখানটা উঁচু করে রাখতে হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পরিচালনা ও সংরক্ষণ খুবই সহজ। নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করলেই সুষ্ঠুভাবে গ্যাস পাওয়া যায় :

- চার্জিং করার সময় যেন শক্ত ইট, কাঠের টুকরা, মাটির ঢেলা বা পাথর ঢুকে না পড়ে।
- কখনও প্রবেশ নল বন্ধ হয়ে গেলে সরু ও সোজা বাঁশ ঢুকিয়ে নেড়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নলের গায়ে, কুয়ার তলা বা দেয়ালের আঘাত না লাগে।
- গ্যাস নলে পানি জমলে নলের নিকটতম মাথা খুলে পানি বের করতে হয়।
- প্রতিদিন প্ল্যান্ট চার্জ করতে হবে। নতুবা গ্যাস উৎপাদন কমে যাবে। আবার বেশিদিন চার্জ না করলে প্রবেশনল বন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

- তিতাস গ্যাসের মতই এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। এ গ্যাসে কোনো ধোয়া হয় না। হাঁড়ি পাতিল পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত ঘর আলোকিত করা যায়।
- জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রামে-গঞ্জে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিপি ইত্যাদি চালান যায়।
- পাম্প চালিয়ে কৃষি জমিতে পানি সেচ করা যায়।
- এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালান যায়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা নিচে উল্লেখ করা হল :

সাধারণ সুবিধা : বায়োগ্যাসের সাধারণ সুবিধা হচ্ছে, এটা

- পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্যাস।
- উন্নতমানের জৈব সার পেতে সাহায্য করে।
- দূষণমুক্ত পরিবেশের সহায়ক।
- স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখে।

আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা

- বর্জ্য পদার্থ প্ল্যান্টে ব্যবহারের ফলে গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে (রেসিডিউ) তা উন্নতমানের একটি জৈব সার। এতে জৈব পদার্থ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও অনুপরিপোষক সংরক্ষিত থাকে। এ সারের গুণগত মান খুবই উন্নত।
- যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিবেশ দূষিত করে বায়োগ্যাস প্রযুক্তিতে তা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা দুর্গন্ধমুক্ত সারে পরিণত হয়। ঐ সকল আবর্জনায় যে সকল ক্ষতিকর জীবাণু থাকে তাও প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি পরিবেশ দূষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্ন করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করে।
- বর্তমানে গাছগাছড়া, খড়কুটা, নাড়া, গোবর ইত্যাদি রান্নাবান্নার জ্বালানি হিসেবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে মাটি প্রাকৃতিক সার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি গ্রহণ করলে মাটি জৈব চক্র সংরক্ষণের মাধ্যমে জৈব সার লাভে সমর্থ হবে।

- বায়োগ্যাস রেসিডিউ উন্নতমানের জৈব সার, যা মাশরুম, মাছ, মুক্তা, কেঁচো (হাঁস-মুরগী ও মাছের খাবার) চাষের কাজে লাগান যায়।
- আবর্জনা, মানুষ ও পশু-পাখির মল ইত্যাদি যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে মশা-মাছি আকৃষ্ট হয় এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। ফলে রোগ-জীবাণু বিস্তার লাভ করে। এ সকল পদার্থ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহারের ফলে দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে এবং মশামাছি ইত্যাদি আকৃষ্ট হয় না। রোগ-জীবাণু প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় বলে এর স্বাস্থ্যগত সুবিধা অনেক বেশি।

সারসংক্ষেপ

- বিকল্প শক্তি হিসাবে পারমাণবিক শক্তির কথা ধরা যায়, কিন্তু প্রাথমিক ব্যয় ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশে বিকল্প শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।
- বায়োগ্যাস আমাদের দেশে একটি উত্তম জ্বালানি শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গরুর গোবর, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি হতে বায়োগ্যাস অতি সহজ উপায়ে তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের দৈনিক জ্বালানি চাহিদাসহ বাই-প্রডাক্ট হিসাবে জৈব সারের চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তিতাস গ্যাসের অন্য নাম কি?
   ক. হরিপুর গ্যাস খ. কৈলাসটিলা গ্যাস
   গ. বায়োগ্যাস ঘ. বাখরাবাদ গ্যাস

২. বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন কারা?
   ক. গবেষকরা খ. ভূ-তত্ত্ববিদরা
   গ. বৈজ্ঞানিকেরা ঘ. ভূগোলবিদরা

৩. বায়ো অর্থ কি ?
   ক. জীব খ. জীবন গ. জৈবিক ঘ. জীবিত

৪. কোনটি সত্য?
   ক. বায়োগ্যাসে ৫০-৬০ ভাগ মিথেন গ্যাস খ. বায়োগ্যাসে ৬০-৭০ ভাগ মিথেন গ্যাস
   গ. বায়োগ্যাসে ৬৫-৭০ ভাগ মিথেন গ্যাস ঘ. বায়োগ্যাসে ৫৫-৬০ ভাগ মিথেন গ্যাস

৫. কোনটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়?
   ক. কাঠ খ. খড়কুটো গ. গোবর ঘ. প্রস্তর কণা

৬. চীন দেশের জমিতে জৈব আবর্তন কত শতাংশ?
   ক. ৫৬ খ. ৬৫ গ. ২৫ ঘ. ৫২

৭. বাংলাদেশে জৈব আবর্তন চক্র কত শতাংশ?
   ক. ১১ ঘ. ২১ গ. ৫১ ঘ. ৬৫

পাঠ ৪.৩

জ্বালানি চাহিদা সংকট ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জ্বালানি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- জ্বালানি সংকট নিরসনে করণীয় পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করতে পারবেন;
- জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জ্বালানি চাহিদা

প্রায় পনের কোটির বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছরে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টনেরও বেশি জ্বালানি শুধু রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহলে সারা বিশ্বে কত পরিমাণ জ্বালানি প্রতি বছর নষ্ট হচ্ছে তা হিসাব করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ রান্নাবান্না ছাড়াও মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে জ্বালানি চাহিদাও বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। আজ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক যুগে কল কারখানা, গাড়ি, রেলগাড়ি, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও খনিজ তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল ইত্যাদি নবায়নযোগ্য নয় সেহেতু এগুলোর পরিমাণ আমরা বাড়াতে পারিনা। দিন দিন আমাদের চাহিদা যেমন বাড়ছে প্রাকৃতিক জ্বালানির পরিমাণও কমে আসছে। দেখতে দেখতে একদিন সব মজুদ শেষ হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক জ্বালানির মজুদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অগ্রগতিও থমকে দাঁড়াবে। জ্বালানি শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :-

মানব সভ্যতা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, শক্তির চাহিদা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কারণ মানুষ জীবন ধারণের জন্য ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য যা কিছু করছে তাতেই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কোনো কিছুই শক্তির ব্যবহার ছাড়া তৈরি করা যায় না। আর বর্তমানে ব্যবহৃত সকল শক্তির মূল উৎসই কিন্তু এই প্রাকৃতিক জ্বালানি শক্তি; যেমন : কয়লা, তেল এবং গ্যাস। শক্তির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথেই প্রাকৃতিক জ্বালানির চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি : বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সব রকমের জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায় এবং তা তৈরি করতে ও যোগান দিতে অধিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং তা আসছে জ্বালানি থেকে।

জাতির উন্নতি : মাথাপিছু ব্যয়িত শক্তিই জাতীয় উন্নয়ন নির্দেশক। যে জাতি যত উন্নত সে জাতির ব্যয়িত শক্তি তত বেশি এবং সে শক্তিও আসে জ্বালানি হতে।

ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি : এর পেছনেও রয়েছে বিদ্যুৎশক্তি। যেমন- রেডিও, টিভি, ভিসিআর, গাড়ি, ফ্রিজ ইত্যাদি চালাতে লাগে বিদ্যুৎ যা মূলত আসে জ্বালানি শক্তি হতে।

উন্নয়ন কার্যক্রম : উন্নয়নকামী দেশে বাড়ি-ঘর, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণেও শক্তি ব্যবহৃত হয় যার উৎসও জ্বালানি শক্তি।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি : বিজ্ঞানের আবিষ্কার মূলত শক্তিকে কাজে লাগানোর কাজেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শক্তির উৎস বা কাঁচামালই হচ্ছে জ্বালানি শক্তি। নতুন নতুন শিল্প উদ্ভাবনে তাই জ্বালানি শক্তির চাহিদাও দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

বিলাসিতা ও বেহিসাবী পরিকল্পনার ফলে জ্বালানি শক্তির অপব্যবহারও বাড়ছে। মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম ও যোগাযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের গতিশীলতা। এই গতিশীলতার মূলে হচ্ছে জ্বালানি শক্তি। গতিশীলতার সাথে সাথে জ্বালানি শক্তির চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে।

সংকট নিরসনে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেহেতু, কৃষি কাজের জন্য আমরা এখনও গরু, মহিষ ব্যবহার করে থাকি, সেহেতু এদের বর্জ্য পদার্থ আমরা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়াও প্রতিদিন হাজার হাজার টন কাঁচা আবর্জনা আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিই। এগুলোও আমরা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহার করতে পারি। হিসাবে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রায় ২২ মিলিয়ন গো-মহিষ আছে। ঐ সকল গো-মহিষ দৈনিক প্রায় ২২০ মিলিয়ন কেজি গোবর প্রদান করে। প্রতি কেজি গোবর হতে ১.৩ ঘনফুট (০.০৩৭ ঘনমিটার) গ্যাস হিসাবে বছরে প্রায় ২.৯৭×১০^{৯} ঘন মিটার গ্যাস পাওয়া সম্ভব। এ গ্যাস ১.৫২×১০^{৬} টন কেরোসিন বা ৩.০৪×১০^{৬} টন কয়লার জ্বালানি মানের সমান।

এছাড়া হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আবর্জনা ব্যবহার করেও প্রচুর পরিমাণে বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়। যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানির চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারবে। এমনকি মানুষের মলমূত্র থেকে যে গ্যাস পাওয়া যাবে তার পরিমাণও নেহায়েত কম নয় বছরে প্রায় ১.০×১০^{৯} ঘনমিটার। কাজেই বায়োগ্যাস প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

দিন দিন যে হারে জ্বালানি সংকট দেখা দিচ্ছে তাতে জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজন অত্যধিক। যদি সময়মত সংরক্ষণ করতে না পারি তবে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য তা মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে। বর্তমানে শহর এমনকি গ্রামাঞ্চলেও জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর সব জায়গায় চলছে এ সংকট। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কলকারখানাও বাড়ছে। কয়লার মজুদ প্রায় শেষের পথে। পেট্রোলের অভাবজনিত কারণে দাম বেড়ে যাচ্ছে। গ্যাসও প্রচুর পরিমাণে মানুষ ব্যবহার আরম্ভ করেছে। একদিন এটারও সংকট দেখা দেবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে মানুষ জ্বালানি কাজে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করে। ফলে বন বাদাড় সব শূন্য হয়ে পড়ছে। বিকল্প হিসাবে বায়োগ্যাস ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ব্যবহার আশানুরুপ নয়। এই বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শহর ও নগর জীবনের পার্থক্য কমিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তির সাহায্যে জৈব গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে সুদূর পল্লীগ্রামেও পরিছন্ন জ্বালানি , ঘর আলোকিত করার সুন্দর ব্যবস্থা, রেডিও টিভি চালানোর মতো বিদ্যুৎ হাতের মুঠোই পাওয়া যাবে। এ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের উপর চাপ কমে যাবে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করে প্রচুর ফসল ফলান যাবে। সর্বপোরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যেতে পারব। সুতরাং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি অবলম্বন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণের উপায়

জ্বালানি শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। জ্বালানি শক্তির ব্যবহারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় জ্বালানি শক্তির অভাব না হয়। এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই মিতব্যয়ী ও সচেতন হতে হবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি-

- প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি যেন আমরা ব্যবহার না করি।
- জ্বালানি শক্তির গুরুত্ব এবং ইহা যে অফুরন্ত নয় সে ব্যপারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানি শক্তি বা যে কোনো শক্তির অপচয় রোধ করা নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতে হবে।
- বিকল্প শক্তি উদ্ভাবনের চিন্তা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে।

- বিনা কারণে গ্যাসের চুলা, বা যে গুলোতে জ্বালানি শক্তি ব্যবহৃত হয় তা বন্ধ রাখতে হবে।

আমরা একটু সচেষ্ট হলে জ্বালানি শক্তির অপব্যবহার রোধ করতে পারি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তির মত সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে পারি। এভাবে আমরা আমাদের জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের প্ল্যান করে অপচয় রোধ করে দেশ ও জাতির তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর নির্মল জীবনের অঙ্গীকার করে যেতে পারি। এ ব্যপারে সবারই সচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

সারসংক্ষেপ

- মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বাড়তে থাকে। এই শক্তির মূল উৎস কয়লা, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎ শক্তিও পরোক্ষভাবে এবং অনেকাংশে কয়লা/তেল/প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জ্বালানি শক্তির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে সংকট বাড়ছে।
- কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ বাড়ছে না কিন্তু চাহিদা বাড়ছে। ফলে শক্তির বিকল্প অনুসন্ধান না করলে মজুদ শেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের উন্নতি থমকে দাঁড়াবে।
- মজুদ সংরক্ষণ এবং বিকল্প জ্বালানি হিসাবে আমাদের দেশে বায়োগ্যাস প্রযুক্তির প্রচলন অত্যন্ত জরুরী। সবাইকে এ জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়?
ক. কাঠ খ. খড়কুটো গ. গোবর ঘ. প্রস্ড়র কণা

২. চীন দেশের জমিতে জৈব আবর্তন কত শতাংশ?
ক. ৫৬ খ. ৬৫ গ. ২৫ ঘ. ৫২

৩. বাংলাদেশে জৈব আবর্তন কত শতাংশ?
ক. ১১ খ. ২১ গ. ৫১ ঘ. ৬৫

৪. বাংলাদেশের সব গো-মহিষের গোবর হতে উৎপন্ন গ্যাস কত টন কয়লার জ্বালানি মানের সমান।
ক. ৩.০৪×১০^{৬} টন খ. ৩.৪০×১০^{১০} টন গ. ৪.৩০×১০^{১০} টন ঘ. ৩.৫×১০^{৯} টন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জৈব জ্বালানি কি? উদ্ভিদ ও প্রাণিজ জ্বালানির তালিকা দিন।
২. ভূ-অভ্যন্তরে কিভাবে খনিজ জ্বালানির সৃষ্টি হয়?
৩. পেট্রোল ও জেট পেট্রোলের ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৪. জীবাশ্ম জ্বালানি কার্বন যৌগ ব্যাখ্যা করুন।
৫. কিরূপে জ্বালানির অপচয় রোধ করা যায়।
৬. বায়োগ্যাস একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যাখ্যা করুন।
৭. বাংলাদেশের জন্য বায়োগ্যাসের গুরুত্ব এত বেশি কেন?
৮. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট কত প্রকার ও কি কি?
৯. কি কি বর্জ্য পদার্থ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহৃত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবাশ্ম জ্বালানি কিরূপে সৃষ্টি হয়েছে? এটি নবায়নযোগ্য নয় কেন?
২. কিরূপে খনিজ তেল আহরণ করা হয়? এর উপাদানগুলোর ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৩. কিভাবে জ্বালানির অপচয় রোধ করা যায় তা আলোচনা করুন।
৪. বিকল্প শক্তির জন্য আমাদের ভাবনা কেন? আমাদের দেশে কি কি বিকল্প শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫. একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৬. বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।
৭. একটি স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৮. জ্বালানি সংকট নিরসনে বায়োগ্যাস প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ : ১. গ ২. গ ৩. ঘ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ : ১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ : ১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ক